সখ্যে সামীপ্যে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন বোস ও মেঘনাদ সাহা

অত্রি মুখোপাধ্যায়

কথাটা শুনেছিলাম ১৯৭০-এ, সাহা ইনস্টিটিউটে ছাত্র অবস্থাতেই। কার কাছ থেকে, মনে নেই। কথাটা এই যে, ১৯৫০-এর ১১ জানুয়ারিতে তৎকালীন ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সত্যেন বোস আসেন নি, তাঁকে নাকি নেমন্তন্নই করা হয় নি। খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম শুনে! যে-সত্যেন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এস সি ক্লাস থেকেই মেঘনাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেই তিনিই বাদ পড়ে গেলেন নিমন্ত্রিতের তালিকা থেকে। কথাটা তখন থেকেই বিঁধে ছিল মনের ভিতরে, কাঁটার মতন।

এর বহু বছর পরে, সেই ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা থেকে অবসরগ্রহণের কিছু পূর্বে, মেঘনাদ সাহা আর্কাইভের পুনর্গঠনের কাজ করতে গিয়ে আমার নজরে আসে অদ্ভুত দুটি দলিল। তার একটি থেকে স্পষ্ট, ১৯৫১ সালে ইনস্টিটিউটের যে-গভর্নিং কাউন্সিল গঠিত হয়, মেঘনাদের জীবদ্দশায় তাতে সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে কখনোই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-সদস্য নির্বাচিত করা হয় নি। দ্বিতীয়টি একটি চিঠি। ১৯৫৩ সালের ৩ জুলাই মেঘনাদ সাহা লিখিত অভিযোগ জানাচ্ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে। অভিযোগ তাঁরই সহকর্মী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিরুদ্ধে। অভিযোগের কারণ, তিনি ছুটিতে, খয়রা অধ্যাপক সত্যেন বোস বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে আছেন, এর মধ্যে তাঁরও হঠাৎ ছুটির প্রয়োজন হওয়াতে বিভাগীয় দায়িত্ব তিনি তাঁর অব্যবহিত পরের অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র বা রিডার নীরজনাথ দাশগুপ্ত অথবা বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরীর হাতে না-দিয়ে, দিয়েছেন উপাধ্যায় শ্যামাদাস চ্যাটার্জিকে। নিয়ম অনুযায়ী দায়িত্ব পাবার কথা শিশির মিত্রেরই। মেঘনাদ বলছেন, এই নীতিবিরুদ্ধ কাজটি করার কোনো অধিকার সত্যেন বসুর নেই। তিনি চান উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট যেন এই মনোনয়নের বিরুদ্ধে যোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

তখনই বুঝেছিলাম, যা শুনেছি তা হয়তো একেবারে মিথ্যা নয়। কলেজ জীবনের বন্ধুতা শেষ জীবনে ঘোর তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছিল। সত্যেন নিমন্ত্রিত হন নি, এ কথাটায় হয়তো বাড়াবাড়ি আছে। আসল কথা, তিনি আসেন নি। আরও খোঁজ নিলে দেখা যায়, তিনি এই ইনস্টিটিউটের অন্য দুটি অনুষ্ঠানেও অনুপস্থিত থেকেছেন, সে দুটির উপলক্ষ্য ছিল ১৯৪৮-এর ২১ এপ্রিলে ইনস্টিটিউটের এবং ১৯৫৬র ১৯ জানুয়ারিতে ইনস্টিটিউট-ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তরস্থাপন। এমন ভাবা অসম্ভব যে, এ তিনদিনের কোনোটিতেই তিনি কলকাতায় ছিলেন না, কিম্বা থাকলেও শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। সত্যি-মিথ্যে যাই হোক, নিমন্ত্রিত না-হবার গুজব যে ছড়িয়েছিল তা থেকেই বোঝা যায়, দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা সেসময়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আবার, মেঘনাদ সাহা আর্কাইভে রক্ষিত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে লেখা মেঘনাদের দুটি পত্র থেকে জানা যাচ্ছে, পরমাণু শক্তি পর্ষদ দেশীয় ছাত্রছাত্রীদের কেন্দ্রীনবিদ্যায় সুশিক্ষিত করে তুলতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পাঠ্যক্রম চালু করতে চলেছে বলে ১৯৪৯ সাল থেকেই একটি প্রচার হয়ে আসছিল। সেই পাঠ্যক্রম প্রণয়নের ভার পড়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উপরে (এটিও খুব আশ্চর্যকর, সাহা থাকতে সত্যেনকে কেন এই ভার দেওয়া হয়েছিল, কেন্দ্রীনবিদ্যায় অন্তত মেঘনাদ সত্যেনের চেয়ে যে অনেকটাই এগিয়ে তা নিয়ে কোনো সংশয় থাকতে পারে না)। ১৯৫৪-র নভেম্বরেও সে-কাজ সমাধা হয় নি। অথচ, তার এক বছর আগেই মেঘনাদ কলকাতায় তাঁর সদ্য-প্রতিষ্ঠিত নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইনস্টিটিউটে কেন্দ্রীন-বিদ্যা শিক্ষণ চালু করে দিয়েছেন। এবারেও, তাঁর অব্যক্ত অভিযোগের তীর সত্যেনের দিকে।

শান্তিময় ও এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় [*সত্যেন্দ্রনাথ বোস* (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট)] ১৯৪৭ সালের আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, প্রায় দুবছর হলো সত্যেন ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন, বিধুভূষণ রায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে যে-পদটি শূন্য হয়েছিল, সেই খয়রা অধ্যাপকের পদটিতে। ঘটনাটি এই, মেঘনাদ গেছেন বিজ্ঞান কলেজে সত্যেনের অফিস ঘরে, ঢুকে দেখেন, সেখানে কোনো এক নবীন বংশীবাদকের বাদন শোনার আয়োজন চলছে। সাহা সত্যেনকে মনে করালেন, মিটিঙে যাবে না? সত্যেন ভুলেই

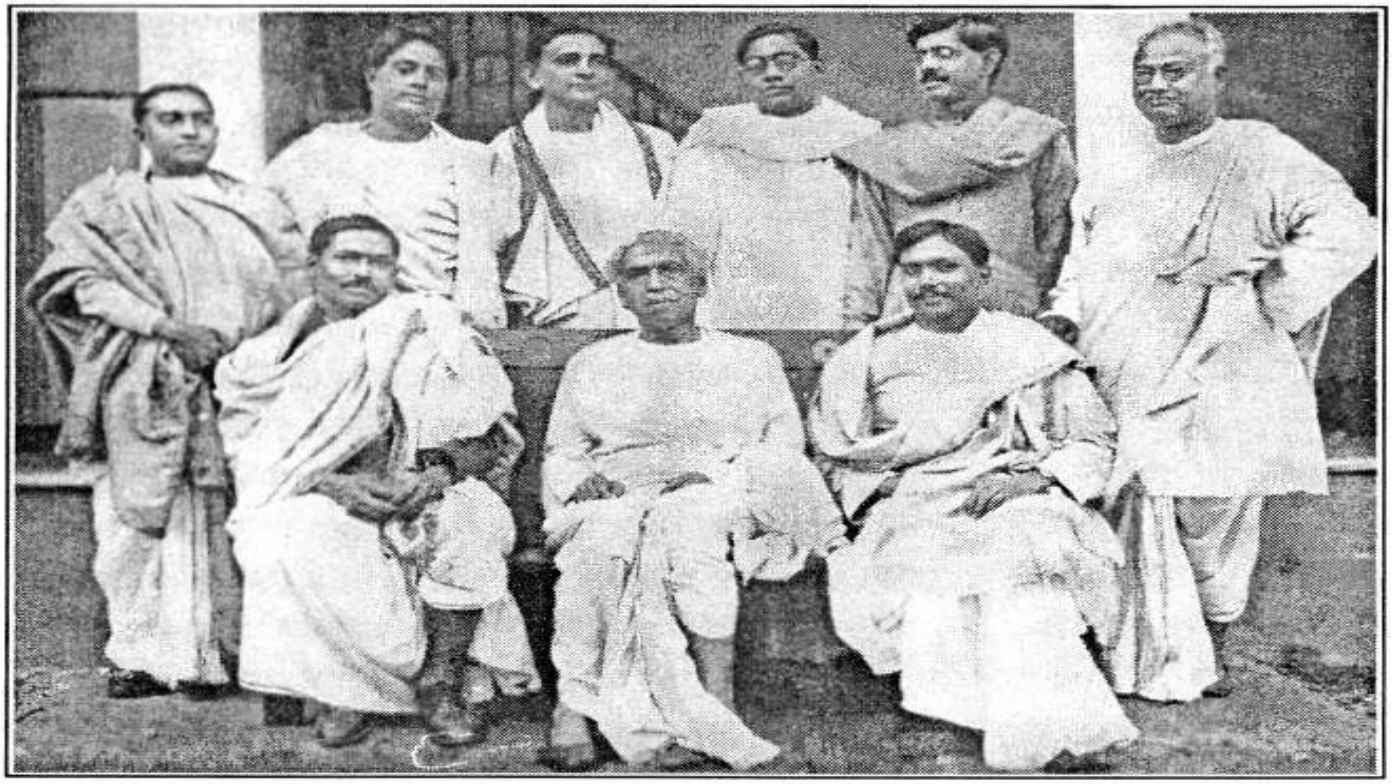

ছাত্রবৃন্দসহ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
বাঁদিক থেকে বসে।। মেঘনাদ সাহা, আচার্য জগদীশচন্দ্র, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে।। স্নেহময় দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রমোহন বসু, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ

গিয়েছেন সে মিটিঙের কথা। কিন্তু, সেটা মুখ্য নয়, সত্যেন বললেন, খুব ভালো বাজায় ছেলেটি, একটু শুনে যাও। মেঘনাদ বুঝলেন, মিটিঙে যাচ্ছেন না সত্যেন। কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ।

এই দুটি ঘটনা থেকে পরিষ্কার, সত্যেন তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদা যে খুব সজাগ থাকেন তা নয়। মেঘনাদ এর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ। দায়িত্বজ্ঞানের অভাব তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন না, বন্ধুর ক্ষেত্রেও না।

দুই.

যবনিকা উত্তোলন ১৯১১-তে। প্রেসিডেন্সি কলেজ। বি এস সি ক্লাস, ঢাকা থেকে আই এস সি করে এসেছেন মেঘনাদ সাহা, সাম্মানিকের বিষয় গণিত। একই বিষয় নিখিলরঞ্জন সেনেরও, ঢাকায় স্কুলে মেঘনাদের সহপাঠী তিনি। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই আই এস সি করে সেখানে জুটেছেন কলকাতা হিন্দু স্কুলের ডাকসাইটে ছাত্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ওদিকে, একই কলেজে আই এস সি-শেষে রসায়ন সাম্মানিক বিষয় নিয়েছেন গিরিডি হাইস্কুলের ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'বড়ো' আর 'ছোটো' জ্ঞান। এঁদের মধ্যে একমাত্র সত্যেনেরই বাড়ি কলকাতায়, বাদবাকি সবাই থাকেন কলেজের পাশেই হিন্দু হোস্টেলে। বন্ধুদের টানে সত্যেনও যান সেখানে মাঝেমধ্যেই। সময়ে সময়ে দুষ্টুমি করতেও ছাড়েন না। জ্ঞান ঘোষের আদি বাড়ি হুগলি জেলার এক গ্রামে, গ্রামের নাম ঘর-গোহাল, তার পোস্ট-অফিস ভাঙামোড়া-য়, তায় আবার জ্ঞানচন্দ্রের পদবী ঘোষ। একবার আস্ত একটি বাছুর ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন সত্যেন ওয়ার্ড ফোরে, জ্ঞান ঘোষদের ঘরে। সে এক হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড!

যদিও এক ক্লাসের বন্ধু, সত্যেনের প্রকৃতি ছিল একটু আলাদা। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছেলেবেলা থেকেই কম, মোটা চশমা নিয়েও তিনি ফুটবল খেলতেন কলেজে। সাধারণত গোলকিপার থাকতেন, তাঁর দলের বিরুদ্ধে গোল দেবার একমাত্র উপায় ছিল তাঁর নাকের উপর থেকে চশমাটাকে খসিয়ে দেওয়া। তাছাড়া, উত্তর কলকাতার বাসিন্দা হওয়াতে তাঁর নিজস্ব একটি বন্ধুবর্গ হয়েই ছিল। সন্ধ্যেবেলায় হেদুয়ায় বসতো তাঁদের আড্ডা। নীরেন রায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়রা সব জড়ো হতেন সেখানে। শিল্প সাহিত্য সংগীত ইত্যাদি নানা বিষয়ে আগ্রহ সত্যেনের। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা' অনুষ্ঠানে বা প্রমথ চৌধুরীর ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়িতে 'সবুজ পত্র'-এর আড্ডাতেও যেতেন। অন্যদের ফুটবল খেলায় তত আগ্রহ নেই, বিকেল হলেই তাঁরা মেলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে, জড়ো হন গড়ের মাঠে রবার্টসনের মূর্তির পাদদেশে, সমাবেশ শেষে কেউ কেউ ফেরেন আচার্যের ফিটন গাড়িতে করে, সত্যেনও যান ক্বচিৎ-কদাচিৎ। এই সভাটিকে মেঘনাদ নাম দিয়েছিলেন 'বেতালের বৈঠক'। নানা দেশে নানান বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক খবর পেতেন তাঁরা আচার্যের কাছে।

বি এস সি ক্লাসে মেঘনাদ যোগ দেওয়ায় জ্ঞানচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে সব চেয়ে বেশি। দুজনের অবস্থার মধ্যেও খানিক মিল ছিল। মেঘনাদ তেমন অবস্থাপন্ন ঘরের

ছেলে নন, তাঁকে খুব কষ্ট করে, অন্যের (ড. অনন্ত দাসের) আশ্রয়ে থেকে, তাদের বাড়ির টুকিটাকি কাজ করে দিয়ে তবে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে, একটি সাইকেল নির্ভর করে ঢাকার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছেলে পড়িয়ে পড়ার খরচ সামলে তিনি এতদূর পৌঁছতে পেরেছেন। টিউশানি করতে হয় এখানেও। কথায় তাঁর ঢাকাই টান, স্বভাবচরিত্রে গোঁয়ার-গোবিন্দ, যাকে বলে কাঠবাঙাল। জ্ঞানচন্দ্র বলতেন, আকাট হীরে। তিনি নিজে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে তাঁদের অবস্থা তখন পড়ন্ত, জলপানির টাকায় কষ্ট করেই চালাতে হয় সবকিছু, বিশেষ করে বি এস সি পড়ার সময়েই বাবার অকালমৃত্যু হওয়াতে চোখে অন্ধকার দেখছিলেন তিনি, একটি সময়ে মনে হয়েছিল, পড়াশুনোয় বুঝি-বা এখানেই ইতি। সহৃদয় অধ্যক্ষ জেমসের বদান্যতায় জ্ঞান কলেজে টিকে গিয়েছিলেন। বাবার জমিজমা, অভ্রখনির চাকরি আর নিজস্ব কাঠের ব্যবসা মার খাওয়াতে তাঁর বেশ কিছু ঋণও চেপে বসেছিল জ্ঞানের কাঁধে। তার উপরে সতীর্থ দাদা নৃসিংহচন্দ্র, গিরিডিতে পাঠরত ছোটো ভাই ভূপেন্দ্রনাথের খরচ সামলানো, এ সবই করতে হয় তাঁর জলপানির টাকায়।

মেঘনাদের উপরে তাঁর নজর পড়ার আরও একটি কারণ ছিল। মেঘনাদ বৈশ্য ঘরের ছেলে, উচ্চ-বর্ণের সহ-আবাসিকরা তাঁকে নীচু চোখে দেখে, তাঁকে আলাদা খেতে বসতে হয় বারান্দায়। ছোটোবেলা থেকেই মেঘনাদ অবশ্য এসবে অভ্যস্ত, কলকাতায় যে তার কিছু এদিকসেদিক হবে তা তিনি আশাও করেন নি, কিন্তু ব্যাপারটি জ্ঞানচন্দ্রদের অসহ ঠেকেছিল; কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে তাঁরা জাতপাত-বৈষম্য ঘোচাবার শিক্ষা পেয়ে এসেছেন, আর এখানে নাকের ডগায় ঘটছে এই সব অনাচার! তাছাড়া, নিভৃতে মেঘনাদের মুখে তিনি শুনেছেন, ছেলেবেলা থেকে কী কষ্ট করেই না তাঁকে বড়ো হতে হয়েছে, সেসব কাহিনি শুনতে শুনতে তাঁর রক্ত গরম হয়ে ওঠে। ১৯১৩-র সরস্বতী পুজোর দিনে হোস্টেলে মেঘনাদকে পুজোপ্রাঙ্গণে অবধি ঢুকতে দেওয়া হল না, অঞ্জলি দেওয়া তো দূরস্থান। সেদিন প্রতিবাদে জ্ঞানচন্দ্রের নেতৃত্বে ক'জন ছাত্র হিন্দু হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, তাঁরা ঠাঁই নিলেন কাছেই ছানাপট্টিতে ১১০ নম্বর বাড়ির চারতলায়, সেটিকে আচার্য রায়ের মেস বাড়ি বলে জানতো লোকে। জ্ঞানচন্দ্র, মেঘনাদ, নৃসিংহচন্দ্র, নীলরতন ধর, জ্ঞান মুখার্জি সবাই গিয়ে জুটলেন সেইখানে। নীলরতনের দাদা জীবনরতন তখন ডাক্তার, তিনিই এঁদের অভিভাবক হলেন। ততদিনে অবশ্য তাঁদের বি এস সি করা হয়ে গিয়েছে, এম এস সিতে ঢুকেছেন সবে। রসায়নে জ্ঞানচন্দ্র প্রথম হয়েছেন, পদার্থবিদ্যায় সত্যেন প্রথম, মেঘনাদ দ্বিতীয়, নিখিল সেন সেবারে পরীক্ষায় বসলেন না। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, সাম্মানিক বিষয়ে সত্যেন মেঘনাদকে পরাস্ত করতে পারলেন না, গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর হলো তাঁরই। এর জন্য কলেজ থেকে একটি মেডেলও পেয়েছিলেন মেঘনাদ। শোনা যায়, সত্যেন থাকতে প্রথম হতে পারবেন না বলে মেঘনাদ এম এস সিতে পদার্থবিদ্যা না-নিয়ে মিশ্রগণিতে নাম লেখান, ভেবেছিলেন, সত্যেন যাবে পদার্থবিদ্যায়। পদার্থবিদ্যার ক্লাসে গিয়ে সত্যেন দেখলেন, মেঘনাদ নেই, খোঁজ নিয়ে জানলেন, মেঘনাদ মিশ্রগণিতে, অমনি তিনিও চলে এলেন মিশ্রগণিতে। পরীক্ষার ফল হলো অবধারিত, এম এস সিতে আবার সত্যেন প্রথম, মেঘনাদ দ্বিতীয়। ওদিকে জ্ঞানচন্দ্র বি এস সি, এম এস সি—দুটিতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। পাশ করার

পরেও কিছুদিন তাঁরা প্রেসিডেন্সি কলেজের সাথে যুক্ত ছিলেন, গবেষণার কাজে, কোনো বৃত্তি ছাড়াই। অবশেষে স্যর আশুতোষের চেষ্টায় ১৯১৪-তে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁরা ১৯১৬ সালে সেখানে উপাধ্যায়ের চাকরি পান, প্রথমে রসায়নে জ্ঞানচন্দ্র, তৎপরে মিশ্রগণিতে মেঘনাদ, সত্যেন। মিশ্রগণিতের প্রধান ড. গণেশপ্রসাদের সঙ্গে বনিবনা না-হওয়ায়, স্যর আশুতোষের চেষ্টায় পরে এদুজন চলে আসেন পদার্থবিদ্যা বিভাগে।

সত্যেন-মেঘনাদের সম্পর্ক তখন অন্যরকমের ছিল। ততদিনে ইওরোপীয় বিজ্ঞান এগিয়ে গিয়েছে অনেকটাই, ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে নিউটন, ম্যাক্সওয়েল বোলৎসম্যানের ধ্রুপদী বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিজ্ঞান পড়ানোর সময় থেকেই কর্তৃপক্ষ চাইছিলেন এসব নব্য বিজ্ঞানের কিছু-কিছু বিজ্ঞান কলেজের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হোক। কিন্তু, বাধা বিস্তর। প্রথম কথা, মেঘনাদ, সত্যেন কেউই পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র নন, এসব পড়াতে হলে তাঁদের নিজেদের চেষ্টায় এগুলি পড়ে আয়ত্ত করতে হবে, সে পথও খুব সুগম নয়, কারণ এসব জিনিশের বেশির ভাগই জার্মান ভাষায় লেখা, আর দ্বিতীয়ত, বইপত্রের অভাব। প্রেসিডেন্সি কলেজেও বিজ্ঞানপত্রিকা বলতে এক ফিলসফিকাল ম্যাগাজিন ছাড়া আর বিশেষ কিছুই আসে না। ভাষাটা অবশ্য তেমন কিছু বাধা নয়, কারণ মেঘনাদ অনেক আগে থেকেই এবং সত্যেন পরের দিকে বুঝে গিয়েছিলেন, জার্মান ভাষাটা আয়ত্তে না-থাকলে বিজ্ঞান অগম্য হয়ে থাকবে। মেঘনাদ ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় জার্মান ভাষাকে অতিরিক্ত বিষয় হিশাবে রেখেছিলেন, যদিও জার্মান পড়াবার মতো অধ্যাপক কলেজে ছিল না, খানিকটা নিজের চেষ্টায় এবং কারো কারো সাহায্যে জার্মান ভাষাটি তিনি মোটামুটি শিখে নিয়েছিলেন, পরে এম এস সি পড়ার সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ক্লাস করে সেটিতে খানিক পালিশ চড়লো, সেসময়ে সত্যেনও শিখছিলেন। পরবর্তীকালের প্রখ্যাত ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও জার্মান ক্লাসে তাঁদের সহাধ্যায়ী। বইয়ের সমস্যাটির সমাধান হলো সামান্য বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী দেবেন্দ্রমোহন বসুর সাহায্যে, তিনি খোঁজ দিলেন, শিবপুরে বি ই কলেজের এক অধ্যাপক ব্রুল-এর কাছে পদার্থবিদ্যার অনেক জার্মান বই আছে। ব্রুল জাতে জার্মান, এদেশে তাঁকে আসতে হয়েছিল স্বাস্থ্যের কারণে; ছিল বুকের অসুখ, ডাক্তারে বলেছিল কোনো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গিয়ে থাকতে। তাই তাঁর কলকাতায় আসা। যাইহোক, তাঁর কাছে গিয়ে মেঘনাদ, সত্যেন নিরাশ হলেন না, অধ্যাপক ব্রুল তাঁদের বইপত্র দিয়ে দিলেন। প্রবল উৎসাহভরে দুজনেই পড়তে শুরু করলেন বরের পরমাণুতত্ত্ব, প্লাঙ্কের লেখা; নার্নস্টের লেখা তাপগতিকীর বই। আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে লেখা আইনস্টাইন, মিনকাউস্কির নিবন্ধগুলিও হস্তগত হলো তাঁদের। মহা উৎসাহভরে তাঁরা পড়তে লেগে গেলেন সেসব। অচিরেই তাঁদের মনে হলো, এখনই এই নিবন্ধগুলির ইংরেজি তর্জমা হওয়া উচিৎ। সামান্য বড়ো সতীর্থ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে সত্যেন, মেঘনাদ লেগে পড়লেন তর্জমার কাজে। সেগুলি পুস্তকাকারে সংগ্রথিত করে প্রকাশ করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ১৯২০-তে সেই প্রথম আপেক্ষিকতাবাদের উপর নিবন্ধ-গুলির প্রথম ইংরেজি অনুবাদ। এ ব্যাপারে আইনস্টাইনের অনুমতি চেয়ে তাঁকে চিঠিও লিখেছিলেন তাঁরা, অনুমতি দিতে দ্বিধা করেন নি আইনস্টাইন। তবে শর্ত ছিল, এ বইয়ের বাজার হবে কেবল ভারতবর্ষ।

লক্ষণীয় এই যে, মেঘনাদদের লক্ষ্য শুধু পড়ানো নয়, সেই সঙ্গে গবেষণাও চালিয়ে যাওয়া, কারণ তাঁদের বিশ্বাস, পড়ানো আর গবেষণা একসঙ্গে না-চালালে দুটোই বিফলে যায়। এই অনুবাদ-কর্ম থেকে মেঘনাদ-সত্যেন যে-যার গবেষণার রসদ জুটিয়ে নিয়েছিলেন, যথাসময়ে তার ফলও ফলেছিল আপনাপন কাজে।

কিন্তু তার আগে, যুগ্মভাবে দুটি গবেষণা-নিবন্ধও লিখে ফেলেছেন তাঁরা। আদর্শ বায়বের ক্ষেত্রে 'অবস্থা সমীকরণ' কেমন হয় তা জানাই ছিল, কিন্তু তাতে বায়ব অণুদের বিন্দুসম ক্ষুদ্র বলে ধরা হয়েছিল, অর্থাৎ আয়তন বলে তাদের কিছুই ছিল না। মেঘনাদ ও সত্যেন দুজনে মিলে

PHYSICS DEPARTMENT.
Dacca University.
Dated, the 4th June 1924.

Respected Sir, I have ventured to send you the accompanying article for your perusal and opinion. I am anxious to know what you think of it. You will see that I have tried to deduce the coefficient $\frac{8\pi\nu^2}{c^3}$ in Planck's Law independent of the classical electrodynamics, only assuming that the ultimate elementary regions in the Phase-space has the content h^3. I do not know sufficient German to translate the paper. If you think the paper worth publication I shall be grateful if you arrange for its publication in Zeitschrift für Physik. Though a complete stranger to you, I do not feel any hesitation in making such a request. Because we are all your pupils though profiting only by your teachings through your writings. I do not know whether you still remember that somebody from Calcutta asked your permission to translate your papers on Relativity in English. You acceded to the request. The book has since been published. I was the one who translated your paper on Generalised Relativity.

Yours faithfully
S.N. Bose

আইনস্টাইনকে পাঠানো সত্যেন বসুর প্রথম গবেষণাপত্রের মুখবন্ধ চিঠি (৪ জুন ১৯২৪)

দেখালেন, অণুদের ক্ষুদ্র অথচ সীমিত আয়তন থাকলে সমীকরণের চেহারাখানি কীভাবে বদলে যায়। এর প্রথমটি ১৯১৮ ও পরেরটি ১৯২০ সালের ফিলসফিকাল ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল।

সেই বছরেই সম্পন্ন হলো মেঘনাদের একার সেই তাপীয় আয়ননতত্ত্ব নিয়ে সুবিখ্যাত কাজটি। তারও আগে প্রকাশিত হয়েছে লবণ-জাতীয় দ্রবণে তড়িৎবিশ্লেষণ নিয়ে জ্ঞানচন্দ্রের আলোড়নকারী কাজ। জ্ঞান ও মেঘনাদ দুজনেই যেন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। সত্যেনের তখন দুই-তিনটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হলেও বলবার মতো তেমন কোনো কাজ হয়নি, ডক্টরেট তো নয়ই। ইতিমধ্যে তিনি বিয়েও করে বসেছেন, ফলে স্যর তারকনাথ পালিত বিদেশবৃত্তি নিয়ে বাইরে যাবার পথও রুদ্ধ।

এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিদেশে যাবার সুযোগ আসে জ্ঞানচন্দ্রের ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের, স্যর তারকনাথ পালিত বিদেশবৃত্তির দৌলতে। তাঁরা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রেডরিক ডনানের গবেষণাগারে যোগ দেন। এর পরপরই, ১৯২০র অক্টোবরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে একই জাহাজে যান মেঘনাদ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এক হলেও তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলফ্রেড ফাউলারের গবেষণাগার। এর বছর দুই আগেই নীলরতন ধর লন্ডনে গিয়ে পৌঁছেছেন। ভারতীয় ছাত্রেরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই ক্রওময়েল রোডের ২১ নম্বর বাড়িটিতে গিয়ে উঠতেন। তাঁরাও তাই করলেন। পরে অবশ্য হ্যামস্টেডে ২১ নম্বর হিথহার্স্ট রোডের বাড়িতে চলে যান। ক'দিনের মধ্যে ডনানের গবেষণাগারে যোগ দেন পরবর্তীকালের অন্যতম বিজ্ঞান-নেতৃত্ব শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর। ডনানের গবেষণাগার তখন যেন চাঁদের হাট। মেঘনাদ পরের বছর যখন বিলেত গেলেন তাঁরও ঠাঁই হলো একই বাড়িতে। তাঁরা কাজের সময়ে কাজ করেন, মাঝেমধ্যে দেশে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র প্রশস্ত করা যায় কী করে তাই নিয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, এরই মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যখন তৃতীয়বারের মতো লন্ডনে এলেন, ঠিক হলো, ইংলন্ডে রয়্যাল কেমিকাল সোসাইটির মতো একটি সংগঠন তাঁরা দেশেও তৈরি করবেন। ডনানও তা সমর্থন করলেন। এরই ফলে তাঁরা দেশে ফিরলে ইন্ডিয়ান কেমিকাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালে।

ডনানের গবেষণাগারে যাতায়াত করতেন ডনানের বন্ধু জোশেফ ফিলিপ হার্টগ বলে ম্যাঞ্চেস্টার ওয়েন কলেজের রসায়ন বিভাগের ভূতপূর্ব লেকচারার ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন অ্যাকাডেমিক রেজিস্ট্রার। ১৯০৫-এ লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ যখন ব্যর্থ হয়, তখন থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব খর্ব করার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ছক কষা হচ্ছিল। হার্টগ তার মনোনীত উপাচার্য। ইতিপূর্বে, ১৯১৭-১৯-এ স্যাডলার কমিশনের সদস্য হয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছিলেন, তিনি নিজে রসায়নবিদ, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের সদ্যপ্রকাশিত কাজের সুখ্যাতি তিনি শুনেছিলেন, এবারে তাঁর পড়ানো দেখে তিনি মুগ্ধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা হতেই তিনি ঠিক করে রেখেছেন জ্ঞানচন্দ্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাবেন। সেই ইচ্ছাটি তিনি ব্যক্ত করলেন ডনানের কাছে। ততদিনে জ্ঞানচন্দ্র লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌত রসায়নের অধ্যাপকের একটি চাকরির প্রতিশ্রুতি পেয়ে গেছেন। আহ্বান এসেছিল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও, কিন্তু বিধবা মা'য় থেকে এত দূরে যাবার তাঁর বাসনা ছিল না। ঢাকায় চাকরিটা হলে মায়ের

অনেকটা কাছে থাকা হয়, ঢাকায় চাকরির কথাটা যখন হার্টগ তাঁর কাছে পাড়লেন, ডনানের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল—কিন্তু ও তো লাহোরে পেয়ে গেছে! যাইহোক, হার্টগের পীড়াপীড়িতে তিনি আর আপত্তি করেন নি। তবুও হার্টগের কাছে পাকা কথা দেবার আগে জ্ঞানচন্দ্র চাইলেন একবার আচার্য রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে; আচার্য এক কথায় সম্মতি দিলেন। ফলে ১৯২১-এ জ্ঞানচন্দ্রর ঢাকাতে যোগ দেওয়া একরকম ঠিকই হয়ে গেল। ১৯২০-র ২৯ ডিসেম্বর হার্টগের তারবার্তা এল, জ্ঞানচন্দ্র ঢাকার অধ্যাপক পদটি পেয়ে গেছেন। প্রথাগত নিয়োগপত্র এল পরবছর এপ্রিলে। তাঁর যোগদানের ব্যাপারটি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হয়নি, তার কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ছাড়বার ব্যাপারে যথেষ্ট গড়িমসি করে, তার বৃত্তান্ত বলা আছে অন্যত্র [অত্রি মুখোপাধ্যায়, *আজি রইলে আড়ালে, বিষয় : আচার্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ*, আলোচনাচক্র, সংকলন ১৮, জানুয়ারি ২০০২।]

লন্ডনে থাকতে-থাকতেই হার্টগ একই সময়ে পদার্থবিদ্যার জন্যও উপযুক্ত লোক খুঁজছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে জ্ঞানচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁর মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন তিনি। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, জ্ঞানচন্দ্র সত্যেন বোসের নাম করেন। সত্যেনের তা জানার কথা নয়, ফলে ঢাকায় যখন রিডার পোস্টে সত্যেনের চাকরিটি হয়, তাঁর ধারণা হয়েছিল, কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর নাম সুপারিশ করেছিলেন। এদিকে, কলকাতায় ফিরে হার্টগ সৃত্যেনের সঙ্গেও এ ব্যাপারে আগাম কথা বলে রাখেন। বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা *নেচার*-এ যখন ঢাকায় পদার্থবিদ্যার রিডারের পদ বিজ্ঞাপিত হলো, সত্যেন দরখাস্ত করলেন। মজার ব্যাপার হলো, মেঘনাদও একটি দরখাস্ত ঠুকে দিলেন। কলকাতা ছাড়তে চাইছিলেন তিনিও [দ্র. অত্রি মুখোপাধ্যায়, *অবিনাশ মেঘনাদ সাহা : বিজ্ঞান সমাজ রাষ্ট্র* (অনুষ্টুপ)]। নির্বাচকমণ্ডলী অবশ্য মেঘনাদের চেয়ে সত্যেনকেই অধিকতর প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন সাব্যস্ত করেন।

মেঘনাদ ততদিনে লন্ডন ছেড়ে বার্লিনে অধ্যাপক নার্নস্টের গবেষণাগারে চলে গিয়েছেন। জ্ঞানচন্দ্রও ইওরোপ ছাড়বার আগে ইস্টারের ছুটিতে বার্লিনে মেঘনাদের সঙ্গে মিলিত হন। এই সময়ে জ্ঞানচন্দ্রের বাড়িতে লেখা চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথকেও কিছুদিনের জন্য বার্লিন ঘুরে যাবার অনুরোধ করলে তিনি সাহস করেন নি স্বাস্থ্যের কারণে, স্বাস্থ্য তাঁর কোনোদিনই ভালো নয়, খাবারদাবারের নানান বিধিনিষেধ। যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানিতে তখন খাদ্যব্যবস্থা খুবই বিপর্যস্ত।

চিঠিপত্র থেকে আরও জানা যায়, জ্ঞানচন্দ্রের বিধবা মা তখন ঘরগোহাল ছেড়ে দেওঘরে একটি বাড়ি ভাড়া করে আছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের মাও সেখানে, পৃথক বাড়িতে। বড়ো জ্ঞান ছোটো জ্ঞানের মা-কে বলতেন 'ও বাড়ির মা'; বোঝা যায়, এঁরা শুধু প্রতিবেশীই ছিলেন না, এ দুই পরিবারে যথেষ্ট হৃদ্যতাও ছিল। বার্লিনে যাবার আগে জ্ঞানচন্দ্র তাঁর মাকে লিখছেন, ও বাড়ির মা-কে বলবেন, ছোটো জ্ঞান একেবারে কাজ সেরেই দেশে ফিরবে।

ক'দিন বাদেই সত্যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের আমন্ত্রণ পান। তিনি ঢাকায় যান জ্ঞানচন্দ্রের আগেই, ১৯২১-এর জুনের প্রথম ভাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হবার কথা ১ জুলাই। কিন্তু, হার্টগ চাইছিলেন সবাই একটু আগে-ভাগে এসে নিয়মকানুন প্রণয়ন, সিলেবাস-গঠন ইত্যাদি কাজ একটু এগিয়ে রাখেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচন্দ্রকে ছাড়া নিয়ে খুব

ঝামেলা করে, তাঁর আসতে আসতে হলো ১৯২১-এর ২৪ জুন, পরদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার পৌঁছে গিয়েছিলেন তার আগেই, সত্যেনের সঙ্গে।

জ্ঞানচন্দ্রের মুখে মেঘনাদের সব খবরাখবর পেয়ে সত্যেন পরম আহ্লাদিত। ২১ জুলাই একই কাগজে প্রথমে জ্ঞানচন্দ্র ও পরে সত্যেন্দ্রনাথ আলাদা করে বার্লিনস্থিত মেঘনাদকে চিঠি লিখলেন। দুজনেই বলছেন, অনেক দিন তাঁরা মেঘনাদের কোনো চিঠি পান নি। জ্ঞানচন্দ্র জানাচ্ছেন, দেশে ফেরা থেকে তিনি নানান ঝামেলার মধ্যে আছেন [এই ঝামেলাটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক থেকে ছাড়পত্র পাওয়া নিয়ে। সম্ভবত ঢাকায় মাইনে-কড়ি নিয়েও কিছু টালবাহানা চলেছিল, বাংলা ভাগ হবে ভেবে সরকার আগে থেকেই অনেক সরকারি বাড়িঘর তৈরি করে রেখেছিল, বাংলা ভাগ রদ হওয়াতে তা এখন বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে, এই অজুহাতে মাইনে মেটাবার যথেষ্ট অর্থ বাংলা সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে অস্বীকৃত হয়, ফলে, প্রতিশ্রুতি মতন মাইনে দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না], অথচ হার্টগ তাঁকেই রাখতে আগ্রহী, বিশেষত যখন ঢাকা কলেজে রসায়নের অধ্যাপক ই আর ওয়াটসনের (কানপুর থেকে) ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে, জ্ঞানচন্দ্র আশা করছেন, আগস্ট মাসের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যাবে। জ্ঞান জানতে চাইলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে মেঘনাদ আর কোন কোন জায়গায় গেলেন। জানাচ্ছেন, মেঘনাদের কাজ নিয়ে খুব শীঘ্রই *প্রবাসী*তে একটি লেখা বের হবে [দ্র. ১৩২৭ চৈত্র, ১৩২৮ অগ্রহায়ণ সংখ্যা]। পরের দিকে আছে সামান্য কাজের কথা, লিখছেন, জার্মানির একটি গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিতব্য তাঁর একটি নিবন্ধের প্রুফ তিনি পেয়েছেন, সংশোধন করে পরে তা মেঘনাদকেই পাঠিয়ে দেবেন। এ থেকে বোঝা যাবে, জার্মান ভাষাটা জ্ঞানচন্দ্রেরও আয়ত্তে ছিল। এ চিঠিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে, জ্ঞানচন্দ্র লিখছেন, 'অনেক সময় মনে হয় দেশে ফিরে আসার চেয়ে বিদেশে থাকাই ভালো। তুমি কবে ফিরছ? কর্তার সঙ্গে কি চিঠিপত্র লেখা চলে?' কর্তা মানে, স্যর আশুতোষ। বোঝা যাচ্ছে, যোগদানের আগে হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে-গোলাপী ছবিটি এঁকেছিলেন তাতে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন ছিল। হার্টগের বিশেষ দোষ নেই, অর্থের ব্যাপারে বাংলা সরকারই গোলমাল পাকিয়েছে। এ ঝামেলা পরের বছর এপ্রিলে সত্যেনকেও পোহাতে হয়েছিল।

সত্যেন লিখছেন, কলকাতায় থাকতে কারো কারো কাছ থেকে তিনি মেঘনাদের খবর নিয়মিত পেয়ে আসছিলেন। তাঁর নিজের চিঠি লেখা হয়ে ওঠে নি বলেই মেঘনাদ তাঁকে 'বয়কট' করে থাকবেন। লিখছেন, জ্ঞান ও তিনি এক জায়গাতেই আছেন, তাঁর মুখ থেকে শুনেছেন, মেঘনাদ জার্মানির নানা জায়গায় ঘুরছেন ও নানান বিখ্যাত লোকজনের সাথে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়েছে। তাঁর মিউনিখ যাবার কথাও জেনেছেন, তার সবিশেষ বিবরণ পেতে উৎসুক হয়ে আছেন। তারপরেই লিখছেন, মাসাধিক কাল হলো 'তোমাদের দেশে' এসেছি, এখনও তেমন করে গুছিয়ে উঠতে পারি নি। যন্ত্রপাতি আছে সবই, তবে এতটাই ছন্নছাড়া হয়ে যে, বুঝবার উপায় নেই কোন যন্ত্রাংশটি কার। লাইব্রেরির অবস্থাও ভালো নয়, তবে শীঘ্র সুরাহা হবে বলে জেনেছেন। বিভাগীয় প্রধান ড জেনকিন্স এসেছেন ঢাকা কলেজ থেকে, পদার্থবিদ হিশেবে তেমন কিছু না-হলেও মানুষটি ভালো, ভারতীয়দের কোনো কাজে

বাধা দেন না। তিন বন্ধুর মধ্যে সত্যেনের লেখা এই একটিমাত্র চিঠিই রক্ষা পেয়েছে [মেঘনাদ সাহা আর্কাইভ, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলকাতা]।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরম কার্জন হলের মধ্যে পদার্থবিদ্যা বিভাগ ও রমনায় প্রশস্ত বাগান-ঘেরা বসতবাড়ির শান্ত বিস্তারে সত্যেনের মন বসে যায় অচিরে, তার আভাস আছে জ্ঞানচন্দ্রের চিঠিতেও। সত্যেনের আড্ডাপতি মেজাজটিও ক্রমশ ফিরে আসে, গঠিত হয় 'বারো-জনা' বলে একটি গোষ্ঠী, যার বাকি সদস্য ছিলেন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মামুদ হোসেন, আর্থার হিউজ, পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সর্বাণীসহায় গুহসরকার, হীরেন্দ্রলাল দে ও সুশোভন সরকার। সুশোভন অবশ্য বেশিদিন থাকেন নি ওখানে। সাপ্তাহিক সভা বসতো পালা করে একেক জনের বাড়িতে, মানব সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে চলতো আলোচনা, উপরন্তু খাওয়া-দাওয়া। 'বিজ্ঞান পরিচয়' বলে একটি মাসিকও প্রকাশ করা হতো [বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান সাময়িকী'-র সম্পাদককে ১৯৭৪-এর জানুয়ারিতে লেখা সত্যেনের পত্র, *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন* (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ)] তবে, এটি সত্যেনের ঢাকায় যাবার সঙ্গে সঙ্গেই হয় নি।

১৯২১ থেকে ১৯৩৯, এই দীর্ঘকাল সত্যেন আর জ্ঞানচন্দ্র ঢাকাতেই ছিলেন, মাঝখানে সত্যেনের দুবছর বিদেশে থাকবার সময়টুকু ছাড়া। বিদেশ থেকে তিনি হার্টগকে চিঠি লিখেছেন নিয়মিত, কিন্তু জ্ঞানচন্দ্র বা মেঘনাদকে লেখার কোনো নিদর্শন নেই। ১৯৩৯-এর আগস্টে জ্ঞানচন্দ্র চলে যান ব্যাঙ্গালোরে, সত্যেন ঢাকাতে রয়ে যান আরও আট বছর। থেকে যেতেন হয়তো আরও কিছুটা কাল, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধশেষে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দ্বেষে দীর্ণ ঢাকা তখন আর আগের মতো শান্ত সুন্দর নেই। ১৯৪৫-এ সত্যেন ফিরে এলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তিন.

ইতিমধ্যে ১৯২২-এ জ্ঞানচন্দ্রের বিবাহ হয়েছে। এই বিবাহে মেঘনাদের কিঞ্চিদধিক ভূমিকা ছিল। বিলেত থেকে ফিরে তিনি সস্ত্রীক আছেন বিজ্ঞান কলেজের সন্নিহিত বাদুড়বাগান লেনে। সেবছরই আত্রেয়ী নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসে যখন উত্তরবঙ্গ ভাসে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে মেঘনাদ তখন বন্যাত্রাণের কাজে লিপ্ত। গড়পারে আপার সার্কুলার রোডের পালিত বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়ে নীলিমা পালিতের নাম করে সাহায্য দিলেন ১০০ টাকা। পাড়ার মধ্যে কে দিতে পারে এতগুলি টাকা! কৌতূহলী আচার্য মেঘনাদকে নিয়ে গেলেন সেই বাড়িতে, মেয়েটিকে দেখতে চান তিনি। জানতে পারলেন, মেয়েটি অনূঢ়া, বিবাহের কথাবার্তা চলছে। মেয়েটিকে দেখে মেঘনাদ আচার্যকে বললেন, জ্ঞানের উপযুক্ত পাত্রী। আচার্যও সহমত। কথাবার্তা যা বলবার সেসব করলেন আচার্য নিজে। বাড়ি নেই,গাড়ি নেই, এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে মেয়ের বাড়ি থেকে প্রথমে আপত্তি উঠলো। আচার্য আশ্বাস দিলেন, ছেলে সোনার টুকরো, ওসব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়ের মামারা গেলেন ভীষণ চটে, তাঁরা চন্দননগর না কোথায় এক ধনী ঘরের পাত্র ঠিক করে বসে আছেন, কিন্তু তাতে কী হয়, মেয়ের বিবাহ পাকা হয়ে গেল জ্ঞানচন্দ্রের সঙ্গে। আচার্য জ্ঞানচন্দ্রকে শুধু

বললেন, তোমার বিবাহ স্থির করে এলাম। আচার্যের ইচ্ছা জ্ঞানচন্দ্রের শিরোধার্য। বন্যা-পীড়িতের কল্যাণসুবাদে সেই বিবাহ সম্পন্ন হলো ১৯২২-এর জুন মাসে বর্ষণে থৈ-থৈ জলে ভাসা দিনে, হর্তকীবাগানের এক স্কুল বাড়িতে। রাস্তায় চৌকি পেতে বরের যাবার রাস্তা করতে হয়েছিল। বিবাহ-বাসরে সারা রাত সত্যেনের এস্রাজ বাদন ছিল যেমন চমকপ্রদ, কিছু কম চমকপ্রদ ছিল না নবদম্পতিকে বাড়ি পৌঁছোনোর পথে ঘোড়ার গাড়ির ভিতরে বর-কনের সঙ্গে সত্যেনের অধিষ্ঠান, আর মেঘনাদ? তিনি স্বেচ্ছায় জায়গা নিলেন গাড়ির সামনে, গাড়োয়ানের পাশে। তিনি তো সম্পর্কে ভাসুর, বৌয়ের সাথে বসবেন না! যৌবনের এই আস্থা-ভরপুর মধুর বন্ধুত্ব কোনো-কোনো সময়ে মতান্তরে টান-টান হয়ে ছিঁড়ে পড়ার পূর্বমুহূর্তে জ্ঞানচন্দ্রের ভূমিকা ছিল ধন্বন্তরীর মতো। তাঁর মধ্যস্থতায় মেঘনাদ, সত্যেন দুজনেরই অগাধ বিশ্বাস! কিন্তু, হায়, জ্ঞানচন্দ্র তো আর সর্বদা কাছে থাকেন নি!

ইওরোপ থেকে মেঘনাদ ফিরে এসেছিলেন ১৯২১-এর নভেম্বরে। আবার সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। স্যর আশুতোষের ক্ষমতা ছিল না বিরূপ ইংরেজ শাসকের হাত নিংড়ে টাকা আদায় করে মেঘনাদকে উপযুক্ত গবেষণাগার গড়ে দেবার। ততদিনে পদার্থবিদ্যা বিভাগে রামনের সর্বময় কর্তৃত্ব। খটাখটি লাগলো। মেঘনাদ এলাহাবাদে অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হয়ে চলে গেলেন, কিন্তু পরীক্ষা নেবার কাজে ঢাকায় প্রায়শই তাঁর ডাক পড়তো। সত্যেনই তার মূলে।

ততদিনে ঢাকায় সত্যেনের মন বসে গেছে পুরোপুরি। ক্লাস নেন, পরীক্ষাগার ঢেলে সাজান, নতুন নতুন পরীক্ষা যোগ করেন। তারই ফাঁকে-ফাঁকে অচিরে যে-বিশ্ববিখ্যাত কাজটি তিনি সম্পন্ন করবেন তা নিয়ে আনমনা হয়ে থাকেন। এই সময়ে তাঁর আড্ডাপতি মেজাজে যেন সামান্য ভাঁটা পড়ে। অবশেষে ১৯২৪-এ সম্পন্ন হলো সেই কাজ, যা অতি দ্রুত আইনস্টাইনের হাতে বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নের জন্ম দিয়ে বিখ্যাত করে তুলবে সত্যেনকে। এই কাজটির নেপথ্যকাহিনি নিয়ে একটি গল্প চালু আছে। একবার ঢাকায় গিয়ে মেঘনাদই নাকি তাঁকে পাউলির একটি কাজের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইলেক্ট্রন যখন এক্স্‌রে বিক্ষেপ করে তার ফলাফলে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থির থাকে না—বিক্ষেপণ প্রস্থচ্ছেদের খানিকটা নির্ভর করে ভবিষ্যতের উপরে, অর্থাৎ বিক্ষেপিত রশ্মির কম্পাঙ্কের উপরেও। মেঘনাদ সত্যেনকে বলেন ব্যাপারটি খতিয়ে দেখতে, নিবন্ধখানিও রেখে আসেন তাঁর কাছে। সত্যেন এই সূত্রে ডিবাই ও এরেনফেস্টের কাজগুলি পড়েন এবং তার পরেই সম্পন্ন হয় বোসের সেই কাজ—বস্তুর সঙ্গে ভারসম অবস্থায় থাকা বিকিরণের বর্ণালীবিন্যাসের তাত্ত্বিক নির্ধারণ, —যে বিন্যাসটি প্লাঙ্ক সূত্র বলে প্রসিদ্ধ। এর সাথে পাউলিদের কাজের সম্পর্কটা ঠিক যে কোথায় তা বোঝা ভার। হতে পারে, তিনি ডিবাই-এর কাজ থেকে দশাদেশ বিভাজন সংক্রান্ত যে-মূল্যবান সূত্রটি পেয়েছিলেন তার কথা বলতে চাওয়া হচ্ছে [দ্র. অত্রি মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি বিজ্ঞানীর ইওরোপচর্চা*, অরিন্দম চক্রবর্তী সম্পাদিত *বাঙালির ইওরোপচর্চা* (অনুষ্টুপ, ২০১৬)]। বরং এটি বোঝা সহজ যে, ক্লাসে প্লাঙ্ক সূত্রের ব্যুৎপত্তিকরণ পড়াতে গিয়ে সত্যেন বরাবরই অস্বস্তি বোধ করতেন, কারণ তাতে ধরতে হতো, আলোর আচরণ একবার তরঙ্গস্বরূপ, আরেকবার কণাস্বরূপ। প্লাঙ্ক নিজেও এটি নিয়ে অসুখে ছিলেন। আইনস্টাইনের আলোসংক্রান্ত ভাবনা অনুসারে সত্যেন পুরোটাই আলোর কণাস্বরূপ ধরে

প্লাঙ্ক সূত্রে পৌঁছতে পেরেছেন। সে যাই হোক, সত্যেনের এই কাজটির মধ্যে বেশ কিছু বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ছিল, যা নিয়ে তিনি নিজেও সম্ভবত দ্বিধাপন্ন ছিলেন। নিবন্ধটি প্রথমে পাঠানো হয় ফিলসফিকাল ম্যাগাজিনে, অনেক দিনেও সেখান থেকে যখন কোনো সাড়া এল না তখন (এটিও জ্ঞান ঘোষের পরিবারসূত্রে জানা) জ্ঞানচন্দ্র সত্যেনকে মনে করান আপেক্ষিকতাতত্ত্বের নিবন্ধ-অনুবাদকালে আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপের কথা, বলেন, তাঁকেই একবার পাঠিয়ে দেখ না। সত্যেন তাই করেন। পরের ঘটনা আজ ইতিহাস। আইনস্টাইন সেটি জার্মান ভাষায় তর্জমা করে একটি বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানপত্রে ছাপান এবং কাজটির গুরুত্ব সম্পর্কে সপ্রশংস একটি মন্তব্য জুড়ে দেন। সত্যেনের অজান্তেই ইওরোপে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন এক 'বোসে'—যাকে বাইরের লোকে জার্মান কেউ বলে ভাবছিলেন। ছাপা নিবন্ধটি তখনও সত্যেনের হস্তগত হয় নি। আইনস্টাইন একটি পোস্টকার্ড লিখে ব্যাপারটি সত্যেনকে জানান। ঢাকায় চাকরির নিরাপত্তা এবং তাঁর বহু কাঙ্ক্ষিত বিদেশযাত্রার পক্ষে এই পোস্টকার্ডটি পাশপোর্টের কাজ করেছিল। এরপর প্রায় দুবছর ফ্রান্স জার্মানি করে আইনস্টাইনসহ বহু ইওরোপীয় মনীষীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে, কিছুদিন মরিস ডি ব্রঈ ও মাদাম কুরির গবেষণাগারে কাজ করে (কিন্তু একটিও গবেষণানিবন্ধ প্রকাশ না-করে) তিনি ঢাকায় ফিরলেন ১৯২৬-এর গ্রীষ্মে। এবারেও অধ্যাপকের পদটি পেয়ে গেলেন সহজেই, কারণ এক, আইনস্টাইনের চিঠি, দুই, প্রথম মনোনীত প্রার্থী দেবেন্দ্রমোহন বসু ঢাকায় আসতে চাইলেন না। ১৯৪৫ পর্যন্ত সত্যেন এই পদে আসীন ছিলেন। পশ্চিমে আহৃত জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করেছিলেন তিনি ঢাকায়, শিক্ষণ-স্বার্থে।

১৯৩৬-৩৭-এর ঘটনা। মেঘনাদ একবার ঢাকায় এসেছেন এলাহাবাদ থেকে, কার্জন হলে তাঁর বক্তৃতা। তখন তিনি আবহমণ্ডলে বেতারতরঙ্গের প্রবাহ নিয়ে কাজ করছেন। স্বয়ং অ্যাপল্টন তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন। শ্রোতৃমণ্ডলের মধ্যে আসীন সত্যেন্দ্রনাথ। একটি সমীকরণ বোর্ডে নামিয়ে মেঘনাদ একটু থামলেন, সত্যেনের দিকে ফিরে বললেন, এর সমাধান আমার জানা নেই, প্রফেসর বোস কি বলতে পারেন কী হবে? সত্যেন লেগে পড়লেন কাজে, ক'দিনের মধ্যে সমাধানও কষে দিলেন।

এই ছিল সত্যেন আর মেঘনাদের সম্পর্ক। ঢাকা অবধি। সেখানে থাকতে কারো সঙ্গে সত্যেনের কোনো বিরোধ নেই।

চার.

১৯২৬-এর ৭ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় অতিথি, উঠেছেন অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে। কবি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে ক'দিনের জন্য তাঁকে রাখতে হলো নবাবের বোটে। রমেশচন্দ্র আর তাঁর স্ত্রী ব্যস্ত তাঁকে দেখাশোনার ভার নিয়ে, তাঁদের ছেলে-মেয়েদের তখন দেখবে কে? জ্ঞানচন্দ্র তাদের নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে।

আবার, ১৯৩৯-এর আগস্টে জ্ঞানচন্দ্রকে যখন ঢাকা ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে ডিরেক্টর পদে যোগ দিতে হলো, তখন তাঁর বড়ো কন্যা ললিতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র অরুণ ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার্থী। এদের দুজনকে জ্ঞানচন্দ্র নির্ভয়ে রেখে

গেলেন সত্যেনের বাড়িতে। পরবর্তীকালে সেকথা স্মরণ করে ললিতা লিখছেন, 'প্রায় ছ'মাস আমরা দুজনে সত্যেন কাকুর বাড়িতে পুত্রকন্যা স্নেহে ছিলাম' '[দ্র. ললিতা রায়চৌধুরী, *রমনায় ছেলেবেলা*, Dr Jnan Chandra Ghosh Birth Centenary Tribute, Ed. S Ray-chaudhury, The Science Association of Bengal, Kolkata, Sept, 1993]। বন্ধুরা ব্যাঙ্গালোরে গেলে তাঁরা হোটেলে উঠতেন না, সপরিবারে তাঁদের সযত্ন ঠাঁই হতো ইনস্টিটিউট-প্রাঙ্গণে অধিকর্তার সুরম্য বাসগৃহে [সূত্র : ড. চিত্রা রায়, মেঘনাদ-দুহিতা]।

এই ললিতার বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন মেঘনাদ। শিমুলিয়া (ডাঃ অনন্ত দাসের বাড়ি যেখানে) ঢাকার কাশিমপুর জমিদারির অন্তর্গত। জমিদার অমিয়প্রসাদ রায়চৌধুরী তখন প্রয়াত, জমিদারি দেখাশোনা করছেন তাঁর অকৃতদার ভাই রায়বাহাদুর অরুণপ্রসাদ। ছাত্র-জীবনে মেঘনাদের আশ্রয়দাতা ডাঃ অনন্ত দাস ছিলেন সে-বাড়ির বাঁধাধরা ডাক্তার। মেঘনাদ তাঁরই কাছ থেকে জানলেন, বাড়ির জ্যেষ্ঠপুত্রটির জন্য একটি উপযুক্ত কন্যার সন্ধান করা হচ্ছে। অমনি মেঘনাদের মনে হলো জ্ঞানচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যাটির কথা, জ্ঞানচন্দ্রকে প্রস্তাব করলেন অরুণপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র অমলেন্দুপ্রসাদের সঙ্গে ললিতার বিবাহ দেবার, জ্ঞানচন্দ্র অন্যথা করেন নি। জমিদার বাড়ি হলে কি হয়, কাশিমপুর তখনও অজ পাড়াগাঁ। কল খুললেই যে-জল আর সুইচ টিপলেই যে-আলো-পাখাতে তাঁরা অভ্যস্ত, তার কোনোটাই নেই সেখানে। তবু আপত্তি হয় নি, এমনই অগাধ আস্থা জ্ঞানচন্দ্রের, মেঘনাদের প্রতি। আপত্তি ওঠে নি বরপক্ষেও, মেঘনাদের ঘটকালি আর জ্ঞানচন্দ্রের কন্যা—এ দুটিতেই তাঁরা আশ্বস্ত। বিবাহ সুসম্পন্ন হলো যথারীতি। পরে, জ্ঞানচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা উমারাণীরও বিবাহ হয় অমলেন্দুপ্রসাদের একমাত্র ভ্রাতা অরবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে।

ব্যাঙ্গালোর ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে জ্ঞানচন্দ্রের অধিকর্তা হবার পিছনেও মেঘনাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রামন অধিকর্তা হিশেবে অপসারিত হবার পর যখন নতুন সর্বাধ্যক্ষের খোঁজ ব্যর্থ হলো, মেঘনাদ তখন নির্বাচন কমিটির অন্যতম সদস্য। তিনি ঢাকায় জ্ঞানচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চান, এই পদটিতে তিনি আসতে ইচ্ছুক কিনা। রসায়নবিদ হিশেবে তখন জ্ঞানচন্দ্রের এবং ঢাকায় তাঁর রসায়নগোষ্ঠীর প্রভূত সুনাম, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে কাজ করবার জন্য ছুটে আসেন। জ্ঞানচন্দ্র সম্মত হলেন। সর্বাধ্যক্ষ-সিলেকশন কমিটি বসলো আবার, এই কমিটি একটি বিদেশি অনুমোদন কমিটির অভিমত সাপেক্ষে কাজ করতে বাধ্য ছিল। সেই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন ফ্রেডরিক ডনান, ইংল্যান্ডে জ্ঞানচন্দ্র যাঁর কাছে কাজ করেছেন। নানা দিক বিচার করে নির্বাচন কমিটি জ্ঞানচন্দ্রকেই ডিরেক্টর হিশেবে মনোনীত করেন।

পাঁচ.

পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত জ্ঞানচন্দ্রের মতামত ও সাহায্য গ্রহণ করেছেন মেঘনাদ শুধু বন্ধুত্বের জোরেই নয়, স্থিরমতি জ্ঞানচন্দ্রের বিচার-বুদ্ধির উপরে তাঁর আস্থা ছিল প্রগাঢ়। এমনি করে, দেশে জাতীয় পরিকল্পনা নিয়ে মেঘনাদ যখনই সুভাষচন্দ্রকে সাধারণ-সভায় বক্তৃতা করিয়েছেন বা তৎপরে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন তার প্রায় সব কটি ক্ষেত্রেই তিনি জ্ঞানচন্দ্রকে সহযোগী করেছেন বা, নিদেন পক্ষে, তাঁর অভিমত প্রার্থনা করেছেন। এই

পরিকল্পনা-নীতি নিয়ে ঢাকায় কার্জন হলে সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে বক্তৃতা দেওয়ানোর ব্যবস্থা করেন জ্ঞানচন্দ্র। মুসলিম লীগের বাংলাশাসনের সেই অস্থির সময়ে মুসলিম লীগের প্রাণকেন্দ্র ঢাকায় সুভাষের বক্তৃতার আয়োজন করা দুঃসাহসিক কাজ বলে মনে করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু সেও সম্পন্ন হলো নির্বিঘ্নে। তার পরেই জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি গঠন করা ঠিক হয় [দ্র. অত্রি মুখোপাধ্যায়, *আজি রইলে আড়ালে*, পূর্বসূত্র]। মেঘনাদ, জ্ঞানচন্দ্র উভয়েই সেই সমিতির সদস্য হলেন। গান্ধীজি ছিলেন পরিকল্পিত অর্থনীতির ঘোর বিরোধী। তাঁকে ঠেকাতে জওহরলালকে সমিতির সভাপতি করা স্থির হলো সুভাষেরই পরামর্শে। এখন জওহরলালের সম্মতির অপেক্ষা।

সেটি নিশ্চিত করতে ১৯৩৮-এ মেঘনাদ গেলেন শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের মতামত নিতে, তিনি সহমত হলে তাঁকে দিয়ে জওহরলালকে এ কাজে রাজি করাতে হবে। মেঘনাদ-সুভাষের পরিকল্পনা কবির মনঃপূত হলো। মেঘনাদের অনুরোধে তিনি জওহরলালকে চিঠি লিখলেন তাঁকে সভাপতি হতে বলে। এর উত্তরে জওহরলাল যখন জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির সদস্যদের মধ্যে জ্ঞান ঘোষ প্রমুখদের সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত সংশয় প্রকাশ করেন, মেঘনাদ কবিকে জানান, জ্ঞান ঘোষের বিচক্ষণতা নিয়ে তিনি জওহরলালকে নিশ্চিন্ত করতে পারেন [দ্র অত্রি মুখোপাধ্যায়, *জাতীয় পরিকল্পনা : মেঘনাদ, সুভাষ ও রবীন্দ্রনাথ*, বাহা, রবীন্দ্রসংখ্যা, ২০১৫]।

শেষজীবনে জ্ঞানচন্দ্র জাতীয় পরিকল্পনা আয়োগের সদস্য হন, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি ও মেঘনাদ খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করেন, যাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি যথাসাধ্য ত্রুটিমুক্ত হয়। দেশে ভারী শিল্প-পত্তনের জন্য জোর সওয়াল করেন জ্ঞানচন্দ্র। মেঘনাদের ইচ্ছাও তদ্রূপ।

দেশে শিল্প, শিক্ষাব্যবস্থা, পরমাণু শক্তির প্রচলন, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি কত-না বিষয় নিয়েই আলাপ-আলোচনা, চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছে এ দুই বন্ধুর মধ্যে!

দামোদর উপত্যকা নিগমের (ডি ভি সি-র) কাজেও জ্ঞানচন্দ্রকে চাইছিলেন মেঘনাদ। মেঘনাদের মানসকল্প এই প্রতিষ্ঠানটি তার জন্মলগ্ন থেকেই নানান দুর্নীতি, অর্থ-অপচয় ও নিষ্কর্মের অভিযোগে দুষ্ট হয়ে ছিল। কোটি-কোটি টাকা গেছে স্বার্থান্বেষীদের পকেটে। মেঘনাদ ততদিনে লোকসভার সদস্য। ১৯৫৪-র ৬ এপ্রিল এবং আগস্টে পার্লামেন্টে তুমুল বিতর্ক হয় এই নিয়ে [দ্র *Meghnad Saha in Parliament*, Ed. S Chatterjee, J Gupta (Asiatic Society)]। তৎকালীন ভারত সরকারের পরিকল্পনা সেচ ও শক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী জয়সুখলাল হাতি-কে লেখা ১৯৫৩ সালের ২৮ আগস্ট ও ২৩ নভেম্বরে মেঘনাদের দুটি চিঠি [মেঘনাদ সাহার অসংগ্রথিত পত্রাবলি ফাইল, মেঘনাদ সাহা আর্কাইভ, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স] থেকে দেখা যায়, তিনি ডি ভি সি-র সভাপতি হিশেবে জ্ঞানচন্দ্রকে চাইছেন। তিনি লিখছেন, প্রশাসক কাউকে যদি সভাপতি করতে হয় তো আমি পি এস রাও-কেই চাইব, কারণ প্রতিবেদন লেখার সুবাদে তিনি ডিভিসির নাড়ী-নক্ষত্র জানেন। বিজ্ঞানীদের মধ্যে আমি একমাত্র ব্যাঙ্গালোর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন অধিকর্তা এবং খড়গপুর আই আই টির প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্তা জ্ঞানচন্দ্র ঘোষেরই নাম করতে পারি। এ দুজনের মধ্যে জ্ঞান ঘোষকে

অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে হয় আমার। তবে, একটি শর্ত আছে, তাঁকে সচিবের পদমর্যাদা দিতে হবে। মি হাতি যেন মন্ত্রী শ্রী গুলজারিলাল নন্দকে এ কথা জানান।

তাঁর নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইনস্টিটিউটের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য হিশেবে মেঘনাদ জ্ঞানচন্দ্রকে ডেকে নেন। জ্ঞানচন্দ্র তখন খড়গপুর আই আই টি-র প্রতিষ্ঠাতা-সর্বাধ্যক্ষ। ঐ পদ থেকে জ্ঞানচন্দ্র যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে এলেন, প্রথানুসারে তিনিই হলেন ইনস্টিটিউটের গভর্নিং কাউন্সিলের সভাপতি। সেসময়ে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মাফিক ইনস্টিটিউটের আর্থিক সহায়তা নিয়মিত ও সুগম করেন জ্ঞানচন্দ্র। এরও আগে, ১৯৪৭ থেকে জ্ঞানচন্দ্র যখন ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন, তখন যুদ্ধের কালোবাজারে ইনস্টিটিউটের নির্মীয়মান ভবনের কাঁচামাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল, জ্ঞানচন্দ্রই এসবের সরবরাহ সুনিশ্চিত করেন।

এ দুজনের বন্ধুতা ভারতের জাতীয় বিকাশের পক্ষে যে কী পরিমাণে সহায় হয়েছিল, তা কথায় প্রকাশ করা যায় না। অন্যদিকে ব্যক্তিগত সম্পর্কটিও ছিল আদ্যন্ত মধুর। জ্ঞানচন্দ্র ব্যাঙ্গালোরে যাবার আগে, দক্ষিণ কলকাতার কেয়াতলা লেন আর এখনকার সাদার্ন অ্যাভিনিউ -এর সংযোগস্থলে অনেকটা জমিসংলগ্ন তাঁর বিরাট বাড়িটি তিনি কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টকে বিক্রি করে দেন, মেঘনাদ সেটি কিনে নেন। এ বাড়ির পিছনের জমিতে মেঘনাদ পরে একটি ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করান। ৩ জুন ১৯৫৫ মেঘনাদ জ্ঞানচন্দ্রকে লিখছেন [জে সি ঘোষ ফাইল, মেঘনাদ সাহা আর্কাইভ, সাহা ইনস্টিটিউট], কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আমি ভবিষ্যনিধির টাকাটা পেয়ে গেছি, বাড়ি তৈরির কাজে তোমার কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছিলাম যদি বলো তো যেখানে বলবে সেখানে আমি টাকাটা পাঠিয়ে দেব। লক্ষণীয়, জ্ঞানচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা এতটাই নির্ভার ছিল যে, কত টাকা নিয়েছিলেন সেটি তিনি জানতে চান উত্তমর্ণ বন্ধুর কাছ থেকেই।

ভারতীয় বিজ্ঞানজগতে মেঘনাদ-জ্ঞানচন্দ্র অক্ষটি একটি সময়ে এমনই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, ভাবা ভাটনাগর শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা সচেষ্ট হয়েছিলেন এই জুটি ভাঙতে, কিন্তু পারেন নি। ১৯৫২-তে দুজনের মধ্যে একটি ঘোঁট পাকাবার চেষ্টায় ছিলেন ভাটনাগর। মেঘনাদ তখন ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ছাড়াও কলকাতায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সের ডিরেক্টর, জ্ঞানচন্দ্র পরিচালন মণ্ডলীর সভাপতি। ভাটনাগর হঠাৎ জিগির তুললেন, একই ব্যক্তি দুটি প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হতে পারবেন না। তিনি বললেন, এরকম কথা নাকি জ্ঞানচন্দ্রও বলেছেন। মেঘনাদ খোঁজ নিয়ে জানলেন, ভাটনাগর জ্ঞানচন্দ্রের কোনো একটি কথার মনগড়া অর্থ করেছেন। মেঘ কেটে যায় এবং মেঘনাদ-জ্ঞানচন্দ্রের বন্ধুতা আমৃত্যু অটুট থাকে।

ছয়.

১৯৫৬ সালে ফেব্রুয়ারিতে দিল্লীতে লোকসভার অধিবেশন চলাকালীন একদিন মেঘনাদ ফোন করেন আকবর রোডে জ্ঞানচন্দ্রকে। জ্ঞানচন্দ্র তখন জাতীয় পরিকল্পনা আয়োগের সদস্য। মেঘনাদের কণ্ঠে ছিল টান-টান উত্তেজনা, আগের দিন লোকসভার অধিবেশনে কোনো একটি

ব্যাপার নিয়ে তিনি জ্ঞানচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে চান, সময়ের অভাব, জিজ্ঞাসা করলেন, পরিকল্পনা আয়োগের দপ্তরে যাবার সময়ে জ্ঞানচন্দ্র কি তাঁকে তুলে নিয়ে যেতে পারবেন, গাড়িতেই তাহলে কথাবার্তা সেরে নেওয়া যায়। তখন জাতীয় পরিকল্পনা আয়োগের দপ্তর ছিল রাষ্ট্রপতি ভবন চত্বরে। সেদিন জ্ঞানচন্দ্রেরও কিছু অসম্পন্ন জরুরী কাজ দপ্তরে গিয়ে সারার তাড়া ছিল, তাঁকে বেরুতে হবে একটু আগেভাগেই, বন্ধুকে সেকথা জানালেন। বললেন, তুমি বরং সোজা যোজনা আয়োগের দপ্তরে আমার ঘরে চলে এসো, কথাবার্তা সেখানেই হতে পারবে। সকলেই জানি, মেঘনাদ সেদিন সেখানে পৌঁছতে পারেন নি, ট্যাক্সি থেকে নেমে চড়াই পথে একটু হাঁটতেই তিনি রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। মাসিভ হার্ট অ্যাটাক! বাঙালির ঘরে ঘরে সেদিন সরস্বতী পুজো। জ্ঞানচন্দ্র এ নিয়ে আমৃত্যু আক্ষেপ করেছেন, সেদিন তাঁকে তুলে নিয়ে গেলে হয়তো এই মৃত্যু এড়ানো যেত।

খবর ছড়ালো বিদ্যুৎবেগে। পার্লামেন্টের অধিবেশন মুলতুবি হয়ে গেল। জ্ঞান ঘোষ প্রাণপণে ফোনে কলকাতায় বিধান রায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে ড. রায়ের মাধ্যমেই কলকাতার বাড়িতে এই দুঃসংবাদ পৌঁছলো। এরই সঙ্গে শেষ হলো আযৌবন বন্ধুতার এক অদ্বিতীয় অধ্যায়। এর অল্পবিস্তর তিন বছর পরে, ২১ জানুয়ারি, ১৯৫৯ যোজনা আয়োগের সদস্য অবস্থাতেই জ্ঞানচন্দ্র প্রয়াত হন।

সাত.

সত্যেনের সঙ্গে মেঘনাদের ঠিক কী হয়েছিল জানা নেই। মেঘনাদ হয়তো ক্রমশ উপলব্ধি করেছিলেন ছাত্র সত্যেন সম্বন্ধে আচার্য রায়-উচ্চারিত একটি বেদবাক্য : সত্যেন একটি অপচয়ী প্রতিভা। বস্তুত, জীবনে কোনো কিছুই তিনি খুব যত্নভরে করেন নি। যে-নিবন্ধটি যৌবনে তাঁকে জগদ্বিখ্যাত করে তোলে তাও যেন অনেকটাই হেলাভরে লেখা, নেহাৎ আইনস্টাইনের হাতে পড়েছিল বলেই তার সদ্‌গতি হয়েছিল। যে-বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা করা নিয়ে তাঁর এত মাতামাতি, সেই ভাষায় তাঁর অধিকাংশ লেখাতে কি সামান্য একটু পারিপাট্য বা যত্ন কাঙ্ক্ষিত ছিল না? সব কিছুতেই তাঁর যেন ছেলেখেলা। মেঘনাদ ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এসবে। বুঝেছিলেন, কোনো গুরুত্বপূর্ণ এবং গঠনমূলক কাজই তাঁকে দিয়ে হবার নয়!

মৃত্যু এক মহান প্রক্রিয়া, তাতে মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্ব-বিরোধ সাধারণত অন্তরালে চলে যায়। এতদসত্ত্বেও, মেঘনাদের মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে কোনো লেখাই লিখতে প্রবৃত্ত হন নি সত্যেন। এমন কি, এই মৃত্যুর চার বছর পরে, নিল্‌স্ বোর যখন সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে মেঘনাদ সাহা স্মারক বক্তৃতা দিতে এলেন সত্যেন বোস তখনও দূরে ছিলেন, বোরের অনুরোধে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসা হয় সভায়! ১৯৬৫ সালে মেঘনাদ সাহা স্মারক বক্তৃতা দিলেন তিনিই, কিন্তু সেখানেও ব্যত্যয় প্রকট, বললেন বাংলায়, যা প্রথাবিরুদ্ধ! যাইহোক, ১৯৬৩ থেকে ১৯৭২ অবধি একাদিক্রমে সাহা ইনস্টিটিউটের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যপদে বহাল ছিলেন সত্যেন। ১৯৭৪-এর ৪ ফেব্রুয়ারিতে তাঁর প্রয়াণের সাথে সাথে ইতিহাসের এক আলো-আঁধারি অধ্যায়ে পূর্ণত যবনিকা নেমে আসে।